বাংলাদেশ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUN 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

064

উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

খালেদ বেলাল

তেরটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠির আবাসস্থল ৫০৮৯ বর্গমাইল বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ঐতিহ্যগতভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত অনগ্রসর এলাকা ছিলো। বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গৃহীত না হওয়ায় সেখানকার সহজ-সরল অধিবাসীরা শিক্ষার আলো তথা আধুনিক জীবনযাত্রার সুফল থেকে মোটামুটি বঞ্চিতই থেকে যায়। এর সাথে যোগ হয় দুর্গম এলাকায় বিভিন্ন উপজাতির ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসজনিত প্রতিবন্ধকতা ও সযত্নে লালিত জীবনবোধ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণে তাদের তীব্র অনীহা। বস্তুতঃ এ সকল কারণে তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দুরূহও ছিলো বটে। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছেন যে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সামনে কোনো বাঁধাই টিকে থাকে না।

১৯৮২ সালের পর থেকে সরকার পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করার জন্য অনেকগুলো যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সচেতনতার আগুনে দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত অজ্ঞতার বরফ গলতে শুরু করে। বর্তমানে উপজাতীয় লোকজন ও শিক্ষাহীনতা সমর্থক ব্যাপার নয়। তারা এখন প্রতিযোগিতামূলকভাবে শিক্ষিত হতে শুরু করেছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের বলিষ্ঠ পদচারণা এক হিরণ্ময় পরিবর্তনের ইংগীতবহ তারা অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসছে। ১৮৯৩ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় ছিলেন উপ-জাতীয়দের মধ্যে প্রথম এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ ব্যক্তি। আর মাত্র গত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এখন উপজাতীয়দের মধ্যে দেখা যায় ডজন ডজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। প্রশিক্ষিত উপজাতীয় শিল্পীরা এখন বেতার, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। দেশ-বিদেশে যাচ্ছে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সদস্য-সদস্যা হয়ে। তারা একক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করছে দেশের প্রধান প্রধান শহরে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সগর্বে তুলে ধরছে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কেউ কেউ এমনকি মহামান্য প্রেসিডেন্টের সফরসংগী হয়ে বিদেশ সফরের সুযোগও পাচ্ছে। পরিবর্তনের হাওয়া কতো প্রবল হতে পারে এটা তারই প্রমাণ। তারা এখন সারা দেশের, সারা দেশ তাদের।

উপজাতীয় জনগণকে প্রায় অন্ধকার পাহাড়ী জীবন থেকে জাতীয় জীবনের উদ্ভাসিত অংগনে উত্তরণের সুযোগ প্রদানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন নিম্নে তার প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

(১) আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ঃ আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়াসহ পড়ার যাবতীয় খরচ কোনো সরকার বহন করেন এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব দেশেই বিরল। কিন্তু বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে একটা নজিরবিহীন ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। অনগ্রসর উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা সদরে একটি করে মোট তিনটি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ছাত্রাবাসে ৭৫ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রী অবস্থান করে লেখাপড়া করছে। এদের খাওয়া দাওয়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করছেন সরকার। একইভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মহলছড়ি, গুইমারা, বালাঘাটা, আলীকদম, দক্ষিণ কুতুকছড়ি ও বিলাইছড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মোট ছয়টি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রত্যেকটি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক ছাত্রাবাসে ৫০ জন ছাত্র ও ২৫ জন ছাত্রীর সরকারী খরচে থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়া করার ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে আবাসিক বিদ্যালয়গুলো নির্মাণে মোট খরচ হয় ৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা।

(২) বর্ধিত সরকারী অনুদান ঃ অর্থনৈতিক দুরবস্থা উত্তরণে সাহায্য করার লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে কয়েকগুণ। এতে করে এ সকল প্রতিষ্ঠান এখন পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে বাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করতে পারছে।

(৩) ম্রো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক স্কুল ঃ কেবল ম্রো উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইউনিসেফ-এর আর্থিক সাহায্যে বান্দরবান ও রুমায় ২টি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ দুটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের যাবতীয় খরচ ইউনিসেফ বহন করে থাকে। এটি একটি অনন্য প্রয়াস।

(৪) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ ঃ উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষায়তনে তাদের জন্য প্রতিবছর নির্দিষ্টসংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার অযোগ্য অনেক উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

(৫) বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা ঃ পাবর্ত্যাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভাব্য আর্থিক অস্বচ্ছলতা বিবেচনা করে প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫,৫০০ ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ৫১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ শিক্ষা বিস্তার সহজতর করার অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি। এ কাজেও সরকার পিছিয়ে নেই। বর্তমানে পার্বত্যাঞ্চলে ৭টি মহাবিদ্যালয় চালু রয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৬৫ সালে এর সংখ্যা ছিলো মাত্র একটি। ১৯৪৭ ও ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে একটি ও পাঁচটি। বর্তমানে এর সংখ্যা ১২টি। ১৯৪৭ সালে সমগ্র এলাকায় কোনো বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিলো না। ১৯৭৬ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টি এবং বর্তমানে ৬৫টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ১৯৪৭ সালে এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ২১টি। বর্তমানে সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজার হাজার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ভিত গড়ে তুলছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ১৮৬২ সালে। ইচ্ছুক উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য এ বছর তৎকালীন জেলা সদর চন্দ্রঘোনাতে একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৯ সালে জেলা সদর রাংগামাটিতে স্থানান্তরের পর এ স্কুলটিও সেখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯০ সালে এ বোর্ডিং স্কুলটিই মনোনীত হয় হাই স্কুলে। চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় এ স্কুল থেকেই ১৮৯৩ সালে এ্যান্ট্রান্স পাস করেন। এর আগে উপজাতীয়দের মধ্যে অন্য কেউ এ্যান্ট্রান্স পাস করেনি। তাঁর জামাতা যামিনী কুমার দেওয়ান ১৯১৪ সালে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হন। চাকমা রাজকুমার কোকোদানেক্ষ ১৯৩৮ সালে বাংলায় এম এ পাস করেন। তিনি উপজাতীয়দের মধ্যে প্রথম এম, এ পাস।

বর্তমান সরকার উপজাতীয়দের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যে সব বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার সুফল ইতোমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। শিক্ষা-দীক্ষায় উপজাতীয় জনগণ মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে যাবে। এমনকি এক্ষেত্রে দেশে অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে তাদের উন্নীত হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এতোগুলো সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পদক্ষেপ